বাংলা ভাষা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি যে কোনো নব্যভারতীয় আর্য ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা রূপে পরিণত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের দিকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ -অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। যে অপভ্রংশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় সেটি মাগধী অপভ্রংশ। বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং তার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর -পরম্পরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। এই পর্বে আমরা এর পুনরুক্তি না ঘটিয়ে বাংলা ভাষার যে লক্ষণ অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনায় তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে সেগুলি উল্লেখ করব এবং বাংলা ভাষার তিনটি কালপর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করব।

লক্ষণ ও স্তরবিভাগ

যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ বাংলা ভাষাকে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে পৃথক করেছে সেগুলি নিম্নরূপ —

(ক) [-ইল, -ইব] যোগে যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের রূপ।

(খ) [-ইয়া, -ইলে, -ইতে] যোগে অসমাপিকার সৃষ্টি।

(গ) [-এর] যোগে সম্বন্ধ পদ, [-বে, -কে, -ক] যোগে গৌণকর্ম - সম্প্রদানের, [-এ, -ত, -তে] যোগে অধিকরণের, [-রা] যোগে কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ সৃষ্টি।

(ঘ) বিশিষ্ট শব্দের যেমন 'দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে, মাঝে, সঙ্গে, তরে, কাছে, পাশে, ঠাঁই' ইত্যাদির অনুসর্গরূপে ব্যবহার, এবং

(ঙ) নানাবিধ শিষ্ট প্রয়োগ (ইডিয়ম)।

বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায় — আদি, মধ্য ও আধুনিক। আদিস্তরের বাংলাকে প্রাচীন বাংলা বলা হয়। আমরা বাংলা ভাষার তিনটি স্তরের যুগবিভাগ, সময়সীমা ও প্রধান নিদর্শনসমূহ একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করতে পারি।

১০০০ খ্রিঃ

চর্যাগীতি — প্রাচীন বাংলা

১২০০ খ্রিঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — আদিমধ্য

১৫০০ খ্রিঃ

বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি — মধ্য বাংলা — অন্ত্যমধ্য

১৮০০ খ্রিঃ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ও খ্রিস্টান মিশনারিদের লেখা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনা ও মৌখিক বাংলা — আধুনিক বাংলা — বর্তমান কাল

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বা আদি স্তরের বাংলায় চর্যাগীতির ভাষা অনুসারে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

(ক) সম যুগ্ম ব্যঞ্জন একক এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হল। নাসিক্য (ঙ, ঞ, ণ, ম) যুক্ত ব্যঞ্জনে পূর্বস্বর দীর্ঘ হল। নাসিক্য ব্যঞ্জন ক্ষীণ হয়ে সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন — ধর্ম- > ধাম, জন্ম- > জাম, মধ্যেন > মঝেঁ (= মাঝে), বৃক্ষ- > রুখ (= রূখ), বন্ধ- > বান্ধ। অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জন রয়ে গেল। যেমন — মিচ্ছা < মিথ্যা।

(খ) পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে অনেক সময় যুক্তস্বর [-ইঅ] ঈ [ই]-কারে পরিণত হল। যেমন — ভণতি > ভণই, জ্বলিত- > জ্বলিঅ, পুস্তিকা > পোথিআ > পোথী।

(গ) প্রাচীন বাংলায় য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি ছিল। যেমন - নিকটে > নিয়ড্ডি (= নিয়ড়ি), আয়াতি > আবয়ি (= আওই), নাকেন > নাবেঁ (= নাএঁ)।

(ঘ) প্রাচীন বাংলায় [- এর, - অর, - র] বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত। যেমন — 'রুখের তেন্তুলি' (গাছের তেঁতুল), 'ডোম্বীএর সঙ্গে' (= ডোমনির সঙ্গে)।

(ঙ) [- ক, - কে, -রে] বিভক্তির দ্বারা গৌণকর্মের ও সম্প্রদানের পদ গঠিত হত। যেমন — নাশক (নাশের জন্য), বাহবকে পারই (বাহিতে পারে), 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (= কেহ কেহ তোরে বিরূপ বলে)।

(চ) অধিকরণের বিভক্তি ছিল [- ই, - এ, - হি, - তে] যেমন — নিয়ড্ডী (= নিয়ড়ি < নিকটে), ঘরে (< গৃহকে)।

রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গে মিল থাকায় কখনো কখনো অধিকরণে [- এঁ] বিভক্তিও পাওয়া যায়। যেমন — ঘরেঁ।

(ছ) অপাদানের অর্থে অধিকরণের অর্থ নিহিত থাকায় অপাদানের অর্থে অধিকরণের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন — 'জামে কাম কি কামে জাম'। অপাদানে অপভ্রষ্ট থেকে আগত [- হু] বিভক্তি দুএকটি পদে পাওয়া গেছে। যেমন — খেপহু, রঅণহুঁ।